প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সম্প্রসারণযোগ্য প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক তথ্যসমূহ

সম্পাদনা ঃ

শেখ এহিউল ইসলাম
বিভাগীয় কর্মকর্তা

মোহাঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া
ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর

মোঃ আহসান হাবীব
ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
রূপাতলী, বরিশাল
জুন ২০১৪ খ্রিঃ

প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সম্প্রসারণযোগ্য প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক তথ্যাদি

ভূমিকা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত। দেশের ১৯টি জেলার ৪৮ টি উপজেলা উপকূলীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত। উপকূলীয় এলাকা দেশের মোট আয়তনের ৩০% এবং মোট জনসংখ্যার ২৮% লোক এ অঞ্চলে বসবাস করে। উপকূলীয় তটরেখা বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে ৭১০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ। এ বিস্তৃর্ণ এলাকায় অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ আছে। জোয়ারের পানির সাথে বয়ে আনা ক্রমাগত পলি পড়ার কারণে প্রতি বছরেই নতুন নতুন চর সৃষ্টি হচ্ছে। অবস্থানগত কারণে দেশের উপকূলীয় এলাকা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাসে প্রতি বছরই কম-বেশি এ এলাকা দূর্যোগ কবলিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত হতে উপকূলীয় জনপদ এবং জীববৈচিত্রের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূলীয় বন বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দেয়। উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৬৬ সন হতে উপকূলীয় চর বনায়নের কাজ শুরু করে। বন বিভাগ এ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ১,৯০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করেছে। এ বনের ৯৪% হলো কেওড়া প্রজাতির একক বন। উপকূলীয় এ বন বর্তমানে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে কেওড়া বনের অনেক গাছ মরে যাচ্ছে। ক্রমাগত পলি পড়া ও পশুচারণের ফলে উপকূলীয় বনভূমির মাটি উঁচু ও শক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে কেওড়া গাছের বর্ধন হার কমে যাচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে গাছে মড়ক দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য প্রধান প্রধান ম্যানগ্রোভ প্রজাতির অনুপস্থিতির কারণে প্রাকৃতিকভাবে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির রিজেনারেশন আসছে না। ফলে উপকূলীয় বনের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট (পিটিইউ) বিভাগটি ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার কৃত্রিম উপায়ে সৃজিত বনাঞ্চলে এবং উপকূল বরাবর জেগে উঠা নতুন চরে টেকসই বন সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন কৌশল, স্থান উপযোগী ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন ও বনায়ন কৌশল, উপকূলীয় উঁচু ভূমির উপযোগী নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতি নির্বাচন ও বনায়ন কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। উপকূলীয় ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় জনপদ ও অবকাঠামো রক্ষায় গবেষণার এ ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক গবেষণায় বেশ কিছু প্রযুক্তি ও তথ্য উদ্ভাবন করা হয়েছে যা টেকসই ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন এবং উপকূলীয় বনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

উদ্ভাবিত সম্প্রসারণযোগ্য প্রযুক্তিসমূহ

১। বিচ্ছিন্ন জার্ম টিউব (অঙ্কুর নল) থেকে পলিব্যাগে তালের চারা উত্তোলন কৌশল

বিবরণ ঃ ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় যে সকল বৃক্ষ প্রজাতিকে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে তালগাছ অন্যতম। উপকূলীয় বেড়ী বাঁধে বনায়নের জন্য তালগাছ অগ্রগন্য প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়। উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প ও উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় বন বিভাগ বেড়ী বাঁধের ঢালে প্রচুর তালের

আঁটি (বীজ) সরাসরি বপন করে। কিন্তু বেড়ী বাঁধে সরাসরি তালের বীজ বপন করে আশানুরূপ চারা জন্মানো সম্ভব হয় নাই। এটার মূল কারণ রোপিত বীজের অধিকাংশই (৯০%) শাঁস খাওয়ার জন্য মানুষেরা উঠিয়ে নিয়ে যায়। পাশাপাশি জোয়ারের পানিতে অনেক গজানো বীজ নষ্ট হয়ে যায়। অনুপযুক্ত পরিবেশে তাল বীজ গজাতে পারে না অথবা গজানোর পর তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তালের ব্যাপক চাষের জন্য বীজ হতে চারা উৎপাদনের একটি সহজ ও সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে পিটিইউ বিভাগ কর্তৃক একটি গবেষণা পরিচালনা করে নার্সারীতে তালের জার্ম টিউব (অঙ্কুর নল) বিচ্ছিন্ন করে পলিব্যাগে চারা উত্তোলন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। এ পদ্ধতিতে ৫০% মাটি, ২৫% কাঠের গুড়া, ২০% গোবর এবং ৫% ছাইয়ের মিশ্রণ দ্বারা ৩৮ সেঃ মিঃ পুরু অস্থায়ী নার্সারী বেড তৈরী করে পরিপক্ক তালের আঁটি বপন করা হয়। প্রায় ৭ সপ্তাহ পর যখন নতুন গজানো ভ্রূণ কান্ড (Coleoptile) অস্থায়ী বেডের মাটির উপরে দৃশ্যমান হয় তখন বীজ থেকে অঙ্কুর নল কেটে আলাদা করা হয়। তারপর মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ দ্বারা ভরাটকৃত ২৫ সে. মি. × ১৫ সে. মি. (১০ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি) বা ৩০ সে. মি × ২২ সে. মি. (১২ ইঞ্চি × ৯ ইঞ্চি) পলিব্যাগে অঙ্কুর নল স্থানান্তর করা হয়। পলিব্যাগে স্থানান্তরের পর এক সপ্তাহ বেডের উপর আংশিক ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর নার্সারীতে ৭-৮ মাস চারা রক্ষণাবেক্ষণ করার পর মাঠে রোপণের উপযুক্ত হয়। এ পদ্ধতিতে উত্তোলিত চারা মাঠে রোপণের পর জীবিতের হার শতকরা প্রায় ৯৪ ভাগ পাওয়া যায়।

চিত্র ১। বিচ্ছিন্ন অঙ্কুর নল থেকে পলিব্যাগে উত্তোলিত তালের চারা

হস্তান্তর পর্যায় ঃ এ প্রযুক্তি বন বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প এবং ফরেষ্ট রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নার্সারী মালিকদের বাণিজ্যিকভাবে তালের নার্সারী উত্তোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় এলাকায় বেড়ী বাঁধ, রাস্তার পাশে, পতিত জমি, উঁচু বনভূমি, বসতবাড়ীর আশেপাশে এবং কৃষি জমির আঁইলে বনায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যা উপকূলীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে।

২। গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারী উত্তোলন কৌশল

বিবরণ ঃ পৃথিবীতে ম্যানগ্রোভ বন সাধারণতঃ সমুদ্রের জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত প্রাকৃতিক বন হিসাবেই দেখা যায়। মনুষ্য সৃজিত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন খুবই সাম্প্রতিক যা অল্প কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারী উত্তোলন কৌশলের পর্যাপ্ত তথ্য খুবই কম ছিল। এ উদ্দেশ্যে পিটিইউ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ১৭ টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির আদর্শ নার্সারী উত্তোলনের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। প্রজাতিগুলি হলো কেওড়া (*Sonneratia apetala*), ছইল্যা (*S. caseolaris*), বাইন (*Avicennia officinalis*), সাদা বাইন (*A. alba*), মরিচা বাইন (*A. marina*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), পশুর (*Xylocarpus mekongensis*), ধুন্দুল (*X. granatum*), সিংড়া (*Cynometra ramiflora*), খলসী (*Aegiceras corniculatum*), কিরপা (*Lumnitzera racemosa*), গোলপাতা (*Nypa fruticans*), হেঁতাল (*Phoenix paludosa*), কাঁকড়া (*Bruguiera sexangula*), গরান (*Ceriops decandra*) এবং গর্জন (*Rhizophora mucronata*)। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হতে মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সুস্থ ও সবল গাছ থেকে পরিপক্ক বীজ সংগ্রহ করতে হয়। গোলপাতা ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির চারা পলিব্যাগে উত্তোলন করা উত্তম। চারা উত্তোলনের জন্য ২৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি. আকারের পলিব্যাগে উত্তম তবে খরচ কমানোর জন্য ১৫ সে.মি. × ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগও ব্যবহার করা যেতে পারে। নার্সারী উত্তোলনের জন্য শুধুমাত্র ভরা মৌসুমে জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় এমন সমতল ভূমি নির্বাচন করা হয়। পাঁচ ভাগ গুড়ো দোআঁশ মাটি এবং এক ভাগ গোবর সারের মিশ্রণ পলিব্যাগে ভর্তি করে ১২ × ১.২ মিটার বেডে সাজিয়ে রেখে ব্যাগে বীজ বপন করা হয়। প্রখর রোদ ও বৃষ্টি থেকে কচি চারাগুলোকে রক্ষার জন্য বীজতলার উপরে প্রাথমিক পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে চালা দেয়া হয়। বীজতলায় নিয়মিত পানি দেয়া এবং আগাছা পরিস্কার করা হয়। নিয়মিত পরিচর্যার পর ১০-১২ মাস বয়সের চারা বাগানে রোপণের জন্য উপযুক্ত হয়।

চিত্র ২। নার্সারীতে উত্তোলিত বিভিন্ন ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বন বিভাগ উপকূলীয় এলাকায় এবং সুন্দরবন বনাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বনায়নে উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

প্রভাব ঃ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা উত্তোলন ও সফলভাবে বাগান সৃজন, বনায়ন কর্মসূচীর ব্যয় হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্থায়ী বন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে ।

৩ । প্রতিষ্ঠিত কেওড়া বনের অভ্যন্তরে স্থানোপযোগী অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল

বিবরণ ঃ বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় এ পর্যন্ত ১,৯০,০০০ হেক্টর মনুষ্য সৃজিত ম্যানগ্রোভ বাগান উত্তোলন করা হয়েছে । উক্ত বাগানের ৯৪ ভাগই হচ্ছে কেওড়া প্রজাতির একক বাগান । কেওড়ার একক প্রজাতির বন সৃজনের ফলে উপকূলীয় এ বন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে । এর মধ্যে কেওড়ার কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণে গাছ মরে যাওয়া উল্লেখযোগ্য । বনভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি, মাটি শক্ত হওয়া, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির অনুপস্থিতি এবং ম্যানগ্রোভ প্রজাতির রিজেনারেশন না আসার ফলে বনের ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দেয় । কাজেই একক কেওড়া বাগানের প্রতিকূল প্রভাব দুর করা এবং টেকসই লাগাতার বন সৃজনের লক্ষ্যে পিটিইউ বিভাগ কর্তৃক কেওড়া বাগানের অভ্যন্তরে ১১ টি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির আন্ডারপ্লান্টিং বাগান সৃজনের পরীক্ষা পরিচালনা করা হয় । উক্ত পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, খলসী, সিংড়া, হেঁতাল এবং গোলপাতা উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায় । আন্ডারপ্লান্টিং বাগান উত্তোলনের জন্য ৯-১২ বছর বয়সের কেওড়া বাগান নির্বাচন করা হয় যেখানে বছরে কমপক্ষে ৩ মাস জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় । জুন-জুলাই মাসে ১০-১২ মাস বয়সের সুস্থ ও সবল চারা প্রজাতিভেদে ১.২ মি. × ১.২ মি. বা ১.৫ মি. × ১.৫ মি. দুরত্বে রোপণ করা হয় । বর্ণিত প্রযুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জীববৈচিত্রের সমৃদ্ধি ঘটবে এবং স্থায়ী ম্যানগ্রোভ বন সৃজনের মাধ্যমে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী অটুট রাখতে সহায়ক হবে ।

চিত্র ৩ । পটুয়াখালী জেলার চর কাশেমে ১৫ বছর বয়সের আন্ডারপ্লান্টিং পশুর বাগান ।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ প্রযুক্তিটি বন বিভাগসহ সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমানে বন বিভাগ প্রযুক্তিটির ব্যবহার শুরু করেছে।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় এলাকায় টেকসই ম্যানগ্রোভ বন সৃজনে ভূমিকা রাখবে যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

চিত্র ৪। ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে ১৪ বছর বয়সের আন্ডারপ্লান্টিং গেওয়া বাগান।

৪। উপকূলীয় অঞ্চলের উঁচুভূমিতে মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল

বিবরণ ঃ বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ প্রজাতির প্রধানতঃ কেওড়ার ব্যাপক বন সৃজন করা হয়েছে। উপকূলীয় উঁচু বনভূমি যেগুলো বছরের কম সময় প্লাবিত হয় সে সমস্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন সৃজনের জন্য ক্রমান্বয়ে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে পলি পড়া এবং পশুচারণের ফলে এ অঞ্চলের অনেক বনাঞ্চলের জমি শক্ত, স্থায়ী ও অনেক উঁচু হয়ে গেছে। এ সকল জমি সাধারণতঃ জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় না। ফলে এখানকার কেওড়া প্রজাতির গাছের বৃদ্ধির হার কমে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে কেওড়া গাছ মারা যাচ্ছে। কাজেই উক্ত ভূমি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বন সৃজনের জন্য আর উপযুক্ত থাকে না। এ সমস্ত ভূমিতে মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির (নন-ম্যানগ্রোভ) বাগান সৃজন করা যায় কিনা তা যাচাই এর জন্য পিটিইউ বিভাগ দীর্ঘদিন যাবত একটি পরীক্ষা পরিচালনা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ১৩ টি নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন করা হয়। উক্ত গবেষণায় উপকূলীয় অঞ্চলের উঁচু জমিতে ৬ টি মূলভুমির বৃক্ষ প্রজাতি লবণাক্ত সহিষ্ণু ও উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রজাতিগুলি হলো ঝাউ (*Casuarina equisetifolia*), রেইন ট্রি (*Samanea saman*), খইয়া বাবলা (*Pithecellobium dulce*), সাদা কড়ই (*Albizia procera*) কালো কড়ই (*Albizia lebbeck)* এবং বাবলা (*Acacia nilotica*)। উক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার অনুৎপাদনশীল উঁচুভূমি বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের উন্নয়ন করা যায়।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বাংলাদেশ বন বিভাগ উপকূলীয় এলাকার উঁচু বনভূমি, বেড়ী বাঁধ এবং রাস্তার ধারে বনায়নের জন্য এ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করছে।

প্রভাব ঃ এ প্রযুক্তিটি উপকূলীয় অনুৎপাদনশীল উঁচুভূমি এবং বসতবাড়ী বনায়নে সহায়ক হবে যা বনের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।

চিত্র ৫ । পটুয়াখালী জেলার সোনার চরে ১৫ বছর বয়সের রেইন ট্রি বাগান ।

চিত্র ৬ । পটুয়াখালী জেলার চর কাশেমে ১৫ বছর বয়সের সাদা কড়ই বাগান ।

৫ । নতুন জেগে উঠা চরে কেওড়া ও বাইন প্রজাতির মিশ্র বাগান উত্তোলন কৌশল

বিবরণ ঃ নতুন জেগে উঠা চরে কেওড়ার মতো বাইনও বনায়নের জন্য প্রথমিক প্রজাতি (pioneer species) হিসাবে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় একক প্রজাতির বনায়নের ফলে কেওড়ার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে । যথোপযুক্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাবে কেওড়ার পাশাপাশি বাইন প্রজাতির বাগান সেভাবে সৃজিত হয়

নাই। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও সঠিক সময়ে রোপণের মাধ্যমে কেওড়া ও বাইনের মিশ্র বাগান উত্তোলন করা যেতে পারে। মিশ্র বাগান ভূমির উৎপাদন বৃদ্ধি করে, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ও রোগ-বালাই প্রতিহত করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে সহায়ক হয়। ফেব্রুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় কাল বাইনের চারা রোপণের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। পলিব্যাগে উত্তোলিত ৮-১২ মাস বয়সী চারা পলিব্যাগ সহ রোপণে সর্বোচ্চ জীবিতের হার পাওয়া যায়। নতুন জেগে উঠা চরে কেওড়া বাগানের পিছনে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাইন প্রজাতির বনায়ন করলে বাইনের সর্বোচ্চ জীবিতের হার পাওয়া যায়। নতুন জেগে উঠা চরকে দুই ভাগে ভাগ করে উপরের অংশে বাইনের বাগান এবং নীচের অংশে কেওড়ার বাগান উত্তোলন করা যায়।

চিত্র ৭। পটুয়াখালী জেলার মাদারবুনিয়ায় ১৫ বছর বয়সের বাইন ও কেওড়ার মিশ্র বাগান।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ তথ্যটি বন বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় ভূমির যথাযথ ব্যবহার, একক কেওড়া প্রজাতি বনায়নের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করবে এবং উপকূলীয় ভূমির উৎপাদনশীলতা বাড়াবে।

৬। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন স্থানে কেওড়া প্রজাতির কাষ্ঠ আহরণের আবর্তন কাল।

বিবরণ ঃ কেওড়া গাছ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনে পর্যায়ক্রমিক আগমনে প্রাথমিক প্রজাতি (pioneer species) হিসাবে পরিচিত। বনভূমি উঁচু হওয়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে এর বর্ধন হার কমে যায় এবং গাছ মরতে শুরু হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ান্তে কেওড়া গাছ পরিপক্ক হয় এবং কর্তনের উপযুক্ত হয়। যেহেতু কেওড়া বনায়নে প্রচুর মুলধন বিনিয়োগ হয়। তাই এর কাষ্ঠ আহরণের আবর্তনকাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ভবিষ্যৎ নীতিমালা গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্যে উপকূলীয় বন বাগান সমূহে এলাকা ভিত্তিক কেওড়ার কাষ্ঠ আহরণের আবর্তনকাল নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্ব্বোচ্চ ১৫-১৮ মিটার উচ্চতার গাছের বাগানের কাষ্ঠ আহরণের আবর্তকাল ১২ বছর এবং ৬, ৯ অথবা ১২ মিটার উচ্চতার গাছের কাষ্ঠ আহরণের

আবর্তনকাল ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত আবর্তকাল সেইসব বাগানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাহা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকবে না এবং ঐ সময়ে উক্ত বনভূমি যথেষ্ট স্থিতি লাভ করবে।

চিত্র ৮। ভোলা জেলার চর জমিরে মনুষ্য সৃজিত কেওড়া বন।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ তথ্যটি বন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ তথাটির ব্যবহারে কেওড়ার সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করবে ও উপকূলীয় কেওড়া বন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হবে।

৭। উপকূলীয় বসতবাড়ীতে কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন

বিবরণ ঃ বসতভিটায় বনায়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বসতভিটাগুলিতে বনজ, ফলদ, জ্বালানী কাঠ ও সবজীর আবাদ হয়ে থাকে। একটি বাড়ী একটি খামার হিসাবে পরিচিত। সকল বসতভিটায় কম-বেশী কৃষি-বনের প্রাকটিস হয়ে থাকে। কিন্তু উপকূলীয় প্রত্যন্ত অঞ্চলের বসতভিটাগুলি নতুন হওয়ায় সাধারণতঃ বৃক্ষশুন্য বা কম গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সেখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র এবং তারা কৃষি কাজ, শ্রম বিক্রি বা মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাদের বসতবাড়ীতে কৃষি-বন প্রাকটিসের মাধ্যমে যাতে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা যায় এবং বসতবাড়ীগুলির ভেজিটেশন বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য দেশের মধ্য উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলের তিনটি গ্রামে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। আটটি কাষ্ঠ জাতীয় বনজ বৃক্ষ এবং ১১টি ফলদ বৃক্ষের চারা সহ মোট ১৯ প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয় এবং মৌসুমী শাক-সবজীর আবাদ করা হয়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, বসতভিটায় রোপিত কাষ্ঠ জাতীয় গাছের মধ্যে রেইন ট্রি, মেহগনি, আকাশমনি, নীম এবং কালো কড়ই এর বেঁচে থাকার হার আশাব্যঞ্জক এবং ফল জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঠাল, পেয়ারা এবং তেতুলের বেঁচে থাকার হার সন্তোষজনক। এর ফলে বসতভিটায় গাছপালার আচ্ছাদন বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে বসতভিটায় শাক-সবজী আবাদ করে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তি আয় করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় ।

চিত্র ৯ । ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে বসতভিটায় রোপিত বনজ ও ফলদ বৃক্ষের গাছ ।

চিত্র ১০ । ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে বসতভিটায় শাক সব্জীর আবাদ ।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ তথ্যটি বন বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে ।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় বসতভিটার ভেজিটেশন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাকৃতি দুর্যোগ থেকে ঘরবাড়ী সুরক্ষা করবে এবং কৃষি-বন প্রাকটিসের মাধ্যমে উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে ।

উদ্ভাবিত তথ্যসমূহ

১। বাংলাদেশের পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় বেড়ী বাঁধে রোপণের জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন

বিবরণ ঃ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প ও উপকূলীয় বেড়ী বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় বন বিভাগ কর্তৃক বেড়ী বাঁধের ঢালুতে পাম জাতীয় গাছ সহ ৩৭ টি বনজ ও ফলদ বৃক্ষ প্রজাতির গাছ রোপণ করা হয়। এ যাবত উপকূলীয় এলাকায় ৮০০০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। পিটিইউ বিভাগ উক্ত বেড়ী বাঁধে স্থানোপযোগী গাছ নির্বাচন করার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকায় লবণাক্ততার তারতম্য রয়েছে। বিভিন্ন লবণাক্ততা মাত্রা ভেদে পূর্ব হতে পশ্চিম উপকূল বরাবর গাছের বৃদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। অঞ্চলভেদে বেড়ী বাঁধ বনায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রজাতিগুলি উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়ঃ-

পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলঃ এ এলাকার বেড়ী বাঁধে ১৪ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। প্রজাতিগুলির বর্ধন হার অনুসারে আকাশমনি (*Acacia auriculiformis*), রেইন ট্রি (*Samanea saman*), ইপিল-ইপিল (*Leucaena leucocephala*), ঝাউ (*Casuarina equisetifolia*) এবং নারিকেল (*Cocos nucifera*) উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া যায়।

মধ্য উপকূলীয় অঞ্চলঃ এ অঞ্চলে ২০ টি বিভিন্ন মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন করা হয়। তন্মধ্যে রেইন ট্রি, আকাশমনি, ম্যানজিয়াম (*Acacia mangium*), আমলকি (*Embelica officinalis*), খেজুর (*Phoenix sylvestris*) এবং নারিকেল উপযোগী প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলঃ এখানে ৩১ টি বিভিন্ন প্রজাতির বাগান উত্তোলন করা হয়। তন্মধ্যে ঝাউ, আকাশমনি, বাবলা (*Acacia nilotica*), অর্জুন (*Terminalia arjuna*), রেইন ট্রি, খইয়া বাবলা (*Pithecellobium dulce*) এবং নারিকেল সবচেয়ে সফল হিসাবে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছপালা লবণাক্ততা সংবেদনশীল। তথাপি কিছু কিছু প্রজাতি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। আকাশমনি, শিশু, ঝাউ, ইপিল ইপিল, অর্জুন, বাবলা, রেইনট্রি, খইয়া বাবলা এবং নারিকেল প্রভৃতি গাছের বিভিন্ন মাত্রার অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে। কম ও মাঝারী লবণাক্ত এলাকায় আকাশমনি, ঝাউ, রেইনট্রি, ইপিল-ইপিল, বাবলা এবং খইয়া বাবলা টেকসই হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সর্বোচ্চ লবণাক্ত এলাকায় ইপিল ইপিল, আকাশমনি, শিশু, ঝাউ এবং বাবলা উপযুক্ত প্রজাতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। সব ধরনের লবণাক্ত এলাকায় নারিকেল সর্বোচ্চ অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয় বেড়ী বাঁধ বনায়নের দ্বারা বেড়ী বাঁধ স্থায়ী, টেকসই এবং সুরক্ষা করা সম্ভব। আবার বেড়ী বাঁধ বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী জোরদার করে তোলা সম্ভব।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় বেড়ী বাঁধে সফল বনায়ন, সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টি এবং বেড়ী বাঁধ টেকসই করণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

চিত্র ১১। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরের চর লক্ষী এলাকায় বেড়ী বাঁধে উত্তালিত বাগান।

২। উপকূলীয় অঞ্চলের অগ্রতট (foreshore) এলাকায় পাম প্রজাতির বনায়ন কৌশল

বিবরণ ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অগ্রতট এলাকায় অনেক অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি আছে যেখানে বছরে অন্ততঃ তিন মাস জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। ভূমিগুলি ম্যানগ্রোভ প্রজতির বাগান সৃজনের জন্য অনুপযুক্ত এবং অনুৎপাদনশীল। উক্ত ভূমিতে মূলভূমির ৪ টি পাম প্রজাতি যথা- তাল, নারিকেল, খেজুর এবং সুপারির বাগান সৃজনের উপর ১৯৯৯ সন হতে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। চারা রোপণের জন্য বিভিন্ন মডেলের ঢিবি প্রস্তুত করা হয় যাতে জোয়ারের পানিতে চারা ডুবে না যায়। নারিকেল ব্যতীত অন্যান্য প্রজাতির চারা পলিব্যাগে উত্তোলন করা হয়। জুন-জুলাই মাসে ১০-১২ মাস বয়সের চারা ঢিবির উপরে রোপণ করা হয়। পরীক্ষায় ৭.৩ মি. × ১.৮ মি. × ০.৫ মি. এবং ৭.৩ মি. ১.৫ মি. × ০.৫ মি. আকৃতির ঢিবিতে সকল পাম প্রজাতির বর্ধণ এবং জীবিতের হার খুবই ভাল পাওয়া যায়।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি ব্যবহারের মাধ্যমে উপকূলীয় অগ্রতট এলাকার ভুমি স্থায়ী করা সহ ঝড়-ঝঞ্জা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

চিত্র ১২ । ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে ১২ বছর বয়সের খেজুর বাগান ।

চিত্র ১৩ । ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে ১২ বছর বয়সের তাল বাগান ।

চিত্র ১৪ । ভোলা জেলার চর কুকরী-মুকরীতে ১২ বছর বয়সের নারিকেল বাগান ।

৩ । ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতমানের বীজের উৎসের উন্নয়ন

বিবরণ ঃ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সৃজিত বাগানের বৃদ্ধি ও উৎপাদন অঞ্চলভেদে ভিন্ন এবং অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় কম। এর অন্যতম কারণ হলো উন্নতমানের বীজ ব্যবহার না করা। এ জন্য দেশের উপকূলীয় এলাকার পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলে বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা এবং ভূমি উপযোগী উন্নতমানের বীজের উৎস তৈরী করা হয়। পূর্ব উপকূলীয় এলাকার মুগাদিয়ায় ৪ হেক্টর, মধ্য উপকূলীয় অঞ্চলের চর নোমানে ৪ হেক্টর, পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের চর দিঘলে ৪ হেক্টর এবং চর তাপসিতে ৪ হেক্টর সহ সর্বমোট ১৬ হেক্টর কেওড়া প্রজাতির বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে ৪ হেক্টর বাইন প্রজাতির বীজ উৎপাদন এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেক বীজ উৎপাদন এলাকা হতে সেখানের স্ব স্ব এলাকার অভিযোজনের উপর ভিত্তি করে দুই ধরণের বীজের উৎস নির্বাচন করা হয়েছে যথা- উত্তম গাছের বীজের উৎস এবং নির্বাচিত গাছের বীজের উৎস। বাগানের অনেক গাছের মধ্য থেকে উত্তম গাছগুলিকে ভাল বীজের উৎস হিসাবে নির্বাচিত করা হয় ফলে তাঁদের প্রতিকুল অবস্থায় টিকে থাকার বাড়তি ক্ষমতা আছে। এসব এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করে বাগান উত্তোলন করলে বাগানের উৎপাদন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বন বিভাগকে তথ্যটি অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ মনুষ্য সৃজিত ম্যানগ্রোভ বনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং বন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪ । অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকায় উঁচু ভূমির টেকসই ব্যবহার

বিবরণ ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমি দখলের প্রবণতা বিগত বছরগুলিতে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার বন বিভাগের ব্যাপক এলাকার বনভূমি ভূমি দস্যুরা দখল করে নিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দখলকৃত বনভূমি উজাড় করে বসতি স্থাপন এবং কৃষি জমিতে রূপান্তরের চেষ্টা

অব্যাহতভাবে চলছে। এ সকল এলাকার জন্য Participatory Rural Appraisal (PRA) দারুণভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। অত্র পিটিইউ বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় ৪ টি জেলায় পিআরএ পরিচালনা করা হয়। তা হলো নোয়াখালী জেলার চর মহিউদ্দিন ও বয়ার চরের মোহাম্মদপুর, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর বাহেরছড়া ও রতনপুর, পটুয়াখালী জেলার আভাত্যার চর ও মাদারবুনিয়া এবং বরগুনা জেলার হরিণঘাটা ও লাঠিমারা। উক্ত সমীক্ষায় প্রতিয়মান হয় যে, অংশগ্রহনকারীগণ প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাঁরা তিনটি প্রধান কৃষি ফসল উৎপাদন করে থাকে এবং দুই ভাবে ভূমি জবর দখল করে থাকে। এক ধরণের দখলদারিত্ব হলো স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকদের সমন্বয়ে সমবায়ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং অপরটি হলো অদৃশ্য জমিদার /নেতৃত্বের দ্বারা। আবার ভাঙ্গন কবলিত লোকেরা অদৃশ্য শক্তির সাথে যোগসাজশে ভূমি দখল করে চাষাবাদ করে এবং তাদেরকে ফসলের ভাগ দেয়। উপরোক্ত বসতি স্থাপনকারীগণ জীবিকা অর্জনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বনভূমি দখল করে ফলে বন বিভাগের সাথে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এভাবে অদৃশ্য শক্তি সহজেই উপকূলীয় বৃক্ষ আচ্ছাদিত উপকূলীয় বন ধ্বংস করে ফেলে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উপকূলীয় উঁচু ভূমির উৎপাদনমূখি ব্যবহার এবং এর সম্পদ রক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলী অগ্রাধিকারভাবে সুফলভোগী পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়। সেখানে চাষাবাদকৃত জমির প্রকৃত চাহিদা রয়েছে। কিন্তু জমির মালিকানা নিয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা ঐতিহ্যগতভাবে বন বিভাগের আওতাধীন। বসতি স্থাপনকারীগণ সকলে একবাক্যে জমি ইজারা গ্রহন সম্পর্কে মজাদার মতামত প্রকাশ করেন। তা হলো প্রথমে ৫ বছরের জন্য জমি ইজারা প্রদান এবং পরবর্তীতে ব্যবহারকারীদের ভূমি ব্যবহারের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে আরো ১৫ বছরের জন্য জমির ইজারা নবায়ন করা। অধিকন্ত আধা-স্থায়ী মালিকানা দলিল সম্পন্ন করা যা ৫০ বছরের কম হওয়া উচিত নয় বলে তারা মতামত প্রকাশ করেন। তাদের সাথে আলোচনায় এটা প্রতিয়মান হয় যে, বৈধ সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং জমির মালিকানা সফল অংশীদারিত্বমূলক বন ব্যবস্থাপনার (Participatory Forest Management) জন্য খুবই প্রয়োজন। Participatory Rural Appraisal এর সুপারিশ হলো জনগণের অংশগ্রহণ এবং তাদের প্রবেশাধিকার গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবভিত্তিক "ভূমি ভোগদখল নীতিমালা" প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত বসতি স্থাপনকারীদের অংশীদারিত্বমূলক বন ব্যবস্থাপনার সুন্দর পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত করা যাতে জাতীয় ক্ষেত্রে তারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বন বিভাগকে তথ্যটি অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে ও উপকূলীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

৫। নতুন প্রতিষ্ঠিত বেড়ী বাঁধে যুগপৎভাবে গাছ ও ঘাস লাগানোর নার্সারী ও বনায়ন কৌশল

বিবরণ ঃ কিছু লোক সন্দেহ পোষণ করে যে, উপকূলীয় বেড়ী বাঁধে বনায়ন করলে ভূমি ক্ষয় বেড়ে যায় কারণ গাছের শিকড়ের মধ্য দিয়ে বৃষ্টি ও জোয়ারের পানি সহজে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠিত বেড়ী বাঁধের ঢালুতে গাছের সাথে ভাটিভার ঘাস লাগিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের ঢালুতে যুগপৎভাবে গাছ ও ঘাস রোপণের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জন্য নার্সারী এবং মাঠ উভয় জায়গায় ঘাস লাগানোর জন্য একই সময়ে একই স্পটে দুইটি টিলার ব্যবহারের মাধ্যমে রোপণের সুপারিশ করা হয়। গাছের ক্ষেত্রে ২.৭৫ মি. × ২.৭৫ মি. দুরত্ব এবং ঘাসের ক্ষেত্রে ০.৩ মি. × ০.৩ মি. দুরত্ব উপযুক্ত হিসাবে পাওয়া

যায়। ঢালুর উপরের দিকে বেশী জীবিত থাকার হার এবং ঘাসের সর্ব্বোচ্চ টিলার পাওয়া গেছে যা ঢালুর উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ক্রমশঃ কমতে থাকে।

চিত্র ১৫। নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে বেড়ী বাঁধে গাছ ও ঘাসের মিশ্র বাগান।

হস্তান্তর পর্যায় ঃ বন বিভাগ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

প্রভাব ঃ উপকূলীয় বেড়ী বাঁধ বনায়ন এবং বেড়ীবাঁধ টেকসই করণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।